সংবাদ
23 MAR 2003
৪

প্রসঙ্গ: পরীক্ষার ফল বিপর্যয়

বিধান মিত্র

গত ক'বছর ধরে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীর পরীক্ষায় অভাবনীয় ফল বিপর্যয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ফল বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে 'নানা মুনির নানা মত' রয়েছে। কেউ কেউ এর জন্য দায়ী করেছেন পরীক্ষার্থীদের নকল-নির্ভরতাকে। কেউ কেউ প্রথাগত পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির কথা বলছেন। কেউবা তর্জনি উঁচিয়ে তাবৎ শিক্ষককুলের মেধা ও কর্তব্যনিষ্ঠাকে পরিহাস করছেন। পরীক্ষার ফল বিপর্যয় সম্পর্কিত মুনিদের উল্লিখিত অভিমতগুলো অবশ্যই সত্যি কিন্তু তারপরও একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। যে 'কিন্তু'র কথা বরাবরই অনুক্ত থেকে গেছে।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক, আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত দু'টি বিদ্যাপীঠ যথাক্রমে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের অন্যতম মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য ঢাকা কলেজ এবং সম্মান শ্রেণীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণত বেছে নেয়। দেশের খ্যাতিমান শিক্ষকদের দ্বারা পাঠ গ্রহণের পর উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়ে থাকে। কিন্তু এ দুটো প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের হার কি একই রকম হয়? কখনোই হয় না। এর কারণ কি?

কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির সবটুকু পড়িয়ে শেষ করে তবেই পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু কলেজের ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি শেষ হোক কিংবা না হোক, ঘোষিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি পড়িয়ে শেষ করতে দেরি হলে, পরীক্ষা গ্রহণের তারিখও পিছিয়ে যায়। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সর্বতোভাবে পাঠ্যসূচির সমাপ্তির সঙ্গে সম্পর্কিত; কিন্তু কলেজের বেলায় এমনটি হওয়ার যো নেই। কলেজের শিক্ষার্থীরা শোচনীয় দুর্ভাগ্যবশত পাঠ্যসূচি অসমাপ্ত রেখেই পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে বাধ্য হয় আর এর প্রতিফল কি তা আমাদের সবারই জানা।

কিন্তু আমাদের কলেজগুলোতে কর্মরত শিক্ষকরা কেন পাঠ্যসূচি পড়িয়ে সমাপ্ত করতে পারেন না? কেন পাঠ্যসূচির মধ্যভাগে সন্তরণশীল শিক্ষার্থীরা অপ্রস্তুত হয়ে পরীক্ষা হলে যেতে বাধ্য হয়? ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক:

আমাদের দেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত ছুটি থাকে ৮৫ দিন। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষা চলাকালীন পাঠদান বন্ধ থাকে আনুমানিক ৩৫ দিন। স্নাতক পরীক্ষার জন্য আনুমানিক ৩০ দিন (রমজান মাসে এ পরীক্ষা না হলে ৩০ দিনের চেয়ে আরও বেশিদিন বন্ধ থাকে)। কলেজের চারটি শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার জন্য বন্ধ থাকে কমপক্ষে ৩০ দিন। অন্যান্য কারণে আনুমানিক ২০ দিন। বছরের ৫২টি শুক্রবারসহ মোটের ওপর ক্লাস বন্ধ থাকে (৮৫+৩৫+৩০+৩০+২০+৫২) দিন= ২৫২ দিন। অর্থাৎ বছরের হিসাবে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় শ্রেণীকক্ষসমূহে পাঠদান প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে। পাঠদান বন্ধ থাকার এ রকম শোচনীয় নজির কোন উন্নত দেশে আছে কি?

না নেই। আর নেই বলেই উন্নত দেশে পরীক্ষায় পাসের হার আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এখানে শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থীর মেধা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কেননা, যে শিক্ষক প্রতি তিন দিনে মাত্র একদিন পাঠদান করার সুযোগ পান, তার পক্ষে পাঠ্যসূচি পড়িয়ে শেষ করা অবশ্যই দুরূহ কাজ। আর শিক্ষক যদি তা করতে অপারগ হন, তবে শিক্ষার্থীদের বলির পাঁঠা বানানো অন্যায় নয়?

তবে হ্যাঁ, শিক্ষার্থীরা অন্যায় কাজ করছে বটে; তারা নিয়মিতভাবে ক্লাস করে না। অনুশীলনী পরীক্ষার দিন তাদের টিকিটি মেলা ভার। মেয়েদের পড়াশোনার ধরন মোটামুটি সন্তোষজনক; কিন্তু ছেলেরা? এদের অনেকেই শ্রেণীকক্ষে একদিন না এসেও 'ফরম ফিলআপ' করার সুযোগ পেয়ে যায়! নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে কিংবা ওই পরীক্ষায় ডাহা ফেল করে শিক্ষার্থীরা কিভাবে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, তা ভেবে দেখতে হবে। তো যারা পাঠকক্ষে আগন্তুক কিংবা বরাবরই অনুপস্থিত, যারা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য, তারা যদি নির্বিচারে মূল পরীক্ষা দেয়ার ছাড়পত্র পেয়ে যায়, তবে ফলাফল বিপর্যয়ের দায় কি সবার ঘাড়ে পড়ে না?

একদিকে পাঠ দিবসের স্বল্পতা, অন্যদিকে পাঠকক্ষের প্রতি শিক্ষার্থীদের প্রবল অনীহা- এ দুইকে ব্যবসায়িক পুঁজি বানিয়ে ফায়দা লুটছে প্রাইভেট টিউটর, কোচিং ব্যবসায়ী আর গাইড বই বিক্রেতারা। তারা মনোলোভা বিজ্ঞাপনের পসরা সাজিয়ে কোমলমতী শিক্ষার্থীদের শিকারের বস্তু বানিয়ে পরীক্ষা পাসের অন্তঃসারহীন গ্যারান্টি দিচ্ছে। বাণিজ্যিক আবরণে আবৃত প্রাইভেট কিংবা কোচিং ব্যবসা, নিম্নমানের গাইড নোট ইত্যাদিকে বুকে জড়িয়ে ধরে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে যায় বটে; কিন্তু তাতে সিংহভাগ শিক্ষার্থী সাফল্যের বদলে বুকে জড়াতে বাধ্য হয়- হতাশার কাফন।

ফলাফল বিপর্যয়ের এই শোচনীয় দুরবস্থা থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করার কি কোন উপায় নেই? নিশ্চয়ই আছে।

প্রথমত, পাঠ দিবস বৃদ্ধি করতে হবে! পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা-সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে অন্যদের পাঠদান কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে। প্রধান ক'টি বিষয়ের পরীক্ষা যেসব দিনে অনুষ্ঠিত হবে, সে দিনগুলোকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দিনে ক্লাস চালিয়ে যাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার নয়। এভাবে ক্লাস চালিয়ে গেলে কমপক্ষে ৬০টি পাঠ দিবস বৃদ্ধি পাবে; তাতে পাঠ্যসূচি পড়িয়ে সমাপ্ত করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে শতকরা ৬০ ভাগের কম উপস্থিতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দানের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় যারা অনুপস্থিত থাকবে কিংবা অনুত্তীর্ণ হবে, তাদের মূল পরীক্ষা থেকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে। এ নিয়ম পুরোপুরি অনুসৃত হলে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি যেমন বাড়বে, তেমনি পরীক্ষায় নকল নির্ভরতা কমে যাবে। আর তাতে পড়াশোনার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

তৃতীয়ত, যদিও ব্যাপারটা খুব সংবেদনশীল তবু বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে কঠোর হাতে বন্ধ করতে হবে প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং ব্যবসা, নোট-গাইড বইয়ের অবাধ বাণিজ্য। এসব নিষিদ্ধ হলে শিক্ষার্থীরা ধার করা চিন্তায় আপাত সমৃদ্ধ না হয়ে, নিজের মেধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবে। তাতে তার বুদ্ধি বিকাশের পথ যেমন সুগম হবে, তেমনি বন্ধ হবে শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্যিক জুয়াখেলা।

শিক্ষক যদি কর্মদিবস বেশি পান এবং পাঠদানের প্রতি নিবেদিত হন, আর শিক্ষার্থী যদি শ্রেণীকক্ষমুখী হয় এবং নিজস্ব ভাবনায় অলংকৃত হয়, তবে শিক্ষার মান উত্তরোত্তর অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। আর শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেতে থাকলে, রোধ করা যাবে পরীক্ষার ফল বিপর্যয়। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো কার্যকর করলে, শিক্ষককুলের পরিশ্রম বেড়ে যাবে। কারও কারও আর্থিক ব্যাপারে আঘাত আসবে; কিন্তু তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার খুব বেশি কারণ নেই। কেননা, জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে এসব বিষয় তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত।

০ বিধানমিত্র, প্রভাষক গৌরীপুর সরকারি কলেজ।